অভিমানী

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

কাশী থেকে মোগলসরাই এলাম একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়।

এর ছ'মাস আগে আমি মুঙ্গেরের পিসিমার বাড়ি থেকে কাশী আসি এমনি নিঃসম্বলে। মুঙ্গেরে পিসিমার বাড়িও এসেছিলাম নিঃসম্বলে নিজের দেশ যশোর জেলার এক অজপাড়াগাঁ থেকে। উদ্দেশ্য, চাকরি খোঁজা। মুঙ্গেরে পিসেমশায়ও পিসতুতো ভাইয়েরা আশা দিয়েছিল চাকরি জুটিয়ে দেবে।তারা তা পারে নি কিংবা করে নি। পিসিমা কেবলই স্তোকবাক্য দিতেন, থাকো না বাপু দুদিন। দেশ থেকে এয়েচ, জলে তো আর পড়ে নেই তুমি। এমন কিছু নয় যে ঘরে তোমার ছেলেমেয়ে কাঁদচে। বলে আপনি আর কপনি—কিসের ভয়তোমার, একটা পেটের জন্যে ?না চাকরি জোটে, পিসিমার কুঁড়েতে দুদিন রইলেই বা।

একথা আমার ভালো লাগলো না। কেনই বা আমি পরের বাড়িতে বরাবর থাকতে আর খেতে যাবো ?তা হবে না। চাকরি পাই, চলে যাবো এখান থেকে। চাকরি যদি না করবো, তবেদেশে কাকার সংসারে থাকলেই তো হত। কিছুতেই যখন কিছুহল না, তখন একদিন কাউকে না বলে মুঙ্গের থেকে রওনাদিলাম। কাশী থেকে অবিশ্যি পত্র দিয়েছিলাম পিসিমাকে, আমি কাশী চলে এসেচি এবং ভালোই আছি, তিনি না ভাবেন।

কাশীতে এই ছ'মাস থেকেও কিছু জোটাতে পারি নি।ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়িয়েচি, যাত্রীদের মুটেগিরি করেচি, কখনোবা হোটেলে বাসন মাজার কাজ করেছি কিন্তু স্থায়ী চাকরি কিছুই জোটাতে পারি নি। এখন এমন দশায় এসে পড়েচি যে আর কাশী থেকে কোনো লাভ নেই, খেতে পাবো না।

আজ সকালে কাশী থেকে হেঁটে এসেচি মোগলসরাই।

বাংলাদেশেই ফিরবো। সকালে একমুঠো ছাতুর দলাখেয়ে পেট-ভরে জল খেয়েছিলাম। সন্ধের সময় ডাউন পার্সেল এক্সপ্রেসে উঠবো ঠিক করে বসে আছি—অনেকে বললে ও ট্রেনে নাকি ভিড় কম হয়। আগে চার-পাঁচখানা ট্রেনেভিড়ের জন্যে উঠতে পারিনি। ভুল করে একখানা মিলিটারিস্পেশালে উঠে বসেছিলাম, হাত ধরে জোর করে নামিয়েদিয়েচে। তখন বেলা আড়াইটে।

বেজায় খিদে পেয়েচে। সন্ধের বেশি দেরি নেই। আমি প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে বসে আছি। আমার কাছেই প্ল্যাটফর্মেরনীচে কয়েকজন পশ্চিমা লোক আটা মাখচে ও ডাল বাছচে।

ওদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক, রোগা, কালো, মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার পাগড়ি জড়ানো—হিন্দিতে আমায় জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবে ?

—বাংলাদেশে।

—মকান ?

—ওই বাংলাদেশেই।

—কোথায় এসেছিলে?

আমি সংক্ষেপে ওদের কাছে আমার কাহিনি সব বললুম।

ওদের মধ্যে আর একজন ছোকরামতো লোক বললে, কিছু খাও নি সারাদিন ?

—ছাতু খেয়েছি ওবেলা।

—এবেলা কি খাবে ?হাতে পয়সা আছে কিছু ?

—না।

ওদের মধ্যে কি কথার বিনিময় হল। একজন দল ছেড়ে উঠে কোথায় গেল, মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে বললে, "বন্ হো গৈল বা"।

ওরা সকলে মিলে আমার মুখের দিকে চাইলে। কি বন্ধ হয়ে গেল, কি ব্যাপার, ওদের জিগ্যেস করলাম। যে লোকটিউঠে গিয়েছিল সে বললে, এখানে ছত্র আছে মুসাফিরদেরজন্যে, আধসের আটাআর আধপোয়া ডাল সেখান থেকে দেয়।তোমার জন্যে আনতে গিয়েছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গিয়েচে।

সেই পাগড়ি-বাঁধা লোকটি বললে, গিয়েচে গিয়েচে, তুমি আমাদের এই খাবার থেকে খেয়ো এখন।

আমি বললাম, না না, তাহয় না ! তোমরা খাও, তোমাদের খাবারে আমি ভাগ বসাবো কেন ?

ওরা সকলে একযোগে আপত্তি করলে। রামজীর লীলা, তিনিই আমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েচেন। তারা যদি না দিয়ে খায়, তবে ধর্ম থাকবে কোথায় ?

আমার আপত্তির পেছনে যে খুব জোর ছিল, তাও নয়।ওরা হাতে চাপড়ে মোটা মোটা চাপাটি তৈরি করলে এবংএকটা মাটির ভাঁড়ে কাঠকয়লার ঢিমে আঁচে অড়রের ডাল চাপিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা পরে রান্না নামিয়ে আমায় দু'খানাচাপাটি এবং সেই চাপাটিরই ওপর খানিকটা অড়রের ডাল ঢেলে দিয়ে বললে, খা লিজিয়ে।

ওদের মধ্যে একজন বললে, ঝুঠামাৎকিজিয়ে, ঠাহরিয়ে থোড়া। এক গো নিমকি লিজিয়ে !

নিম্‌কি অর্থাৎ একখণ্ড লেবুর আচার আমার চাপাটির এককোণে ফেলে দিলে ওপর থেকে, পাছে এঁটো করে থাকিএই ভয়ে।

সবাই একসঙ্গে ভোজন আরম্ভ করা গেল। ওদের ভদ্রতায়মুগ্ধ হলাম। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, জাত নয়, জ্ঞাতিনয়, আমার জন্যে কি মাথাব্যথা ?মানুষের মধ্যেই দেবতা বাস করেন, এ সেদিনও বুঝলাম, এর আগে কাশীতে নিঃসম্বল অবস্থাতেও কয়েকবার বুঝেছিলাম।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে ওদের মধ্যে একজন বললে, বাবুজি, আপ যায়গা হামলোককো সাথ?

—কোথায় যাবো ?

—জিলা চম্পারন, থানা রামনগর, গাঁও মনিয়ারি।

—সেখানে গিয়ে কি করবো ?

—তোমাকে আমরা থাকতে দেবো, খেতে দেবো, তুমি বাঙালি বাবু, আমাদের ছেলেদের ইংরিজি পড়াবে।

—বেশ, যাবো। মনে ভাবলুম আমার আবার কি, যেখানেভাত জোটে সেইখানেই আমার বাড়িঘর।

ওদের গাড়ি এল, আবার কাশীর দিকে যেতে হল। কাশীথেকে গোরখপুর, সেখান থেকে খেয়ায় গণ্ডকী নদী পার হয়েও-টি রেলওয়ের গাড়িতে উঠে পরদিন রাত নটায় নামলাম নারকাটিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আবার ব্রাঞ্চ লাইন গেলরামনগর। রামনগর থেকে হাঁটা-পথে ওদের গ্রাম মনিয়ারিপ্রায় বারো মাইল, মধ্যে সেচ বিভাগের খাল পার হতে হয়দু'বার।

দিন-তিনেক লাগলো সবসুদ্ধকিন্তু এখানে এসে বেশলাগলো।বড় সুন্দর জায়গা। আমি যখন ওদের গ্রামে পৌঁছেচি, তখন বেলা তিনটে। দূরে একটা সাদামতো জিনিস পাহাড়েরমাথায় দেখা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আমি মনিয়ারি ক্যানালপার হবার সময় থেকে পর্যন্ত চেয়ে দেখচি।

বললাম, কি ওটা ?

ওরা বললে, বর্ষ। ও হিমালয় গিরি না হয়, হিমালয়মেযোব বর্ফ গিরতা হ্যাঁয়—

ওই বরফাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য ?কখনো দেখি নি। অমন দেখায় নাকি ?কি অদ্ভুত ! কি সুন্দর ! এদেশে আমি না খেয়েওপড়ে থাকবো।

দিন দুই কাটলো। ওদের মধ্যে পাগড়িপরা আধবয়সীলোকটির নাম মাধোলাল। অতি ভদ্রলোক, অবস্থাও বেশভালো। পাড়াগাঁ অঞ্চলের বড় চাষি গৃহস্থ। পঁচিশ-ছাব্বিশটা দুগ্ধবতী গোরু বাড়িতে, দুধ দেয় প্রায় এক মণ। ধান ও গময যথেষ্ট।

মাধোলালের বাড়িতে ওর মেয়ে রাখনি আমাকে বড় যত্ন করে। কেমন সুন্দর মেয়ে, আর কি শান্ত মুখশ্রী ! এদেশের সকলের মুখেই সারল্য ও নিষ্কলুষতার ছাপ। স্থানটি সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে, হিমালয়ের পদপ্রান্তে অরণ্যভূমির প্রান্তদেশে। মাছ মাংস ডিম খুব মেলে। তবে এখানে মাছ বামাংস সাধারণ লোক খায় না। দুধ ঘি প্রচুর—আগের চেয়ে এখানে এখন আক্রা হয়ে গেলেও অন্য দেশের তুলনায় যথেষ্টসস্তা।

এখানে এসে যেন একটা অদ্ভুত মায়ারাজ্যে এসেছি বলে মনে হল। যেমন সকালের রোদে তেমনি বিকালের রাঙাসূর্যালোকে দূরের তুষারাবৃত হিমালয় কি অদ্ভুত দেখায়। আমিগ্রাম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বনের ধারে পাহাড়ি নদীকুসমাইয়ের ধারে শিলাখণ্ডে বসে থাকি। নদীটার ভালো নাম কি কুসুমবতী ?এ যদি হয়, তবে ওর নাম সার্থক বটে। কত কি পুষ্পিত বন্যলতা ও গাছ যে ঝুঁকে পড়েছে কাচ-স্বচ্ছ জলেরওপর ! যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো, যেখানে খুশি বসেথাকো। খুব বড় শিলাখণ্ড আছে, যার ওপরে আট-দশজনলোক স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। সেখানে ছায়ায় বসতাম আপন মনে। ঘন জঙ্গল ও দূরের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গের দিকে চেয়ে কত কি ভাবতাম নির্জনে !

খেতে পেতাম না কাশীতে। তার আগেও কাকার সংসারেকি হেনস্থা, কি লাঞ্ছনা না গিয়েচে। হাতে পয়সা না থাকলেসবাই নীচুচোখে দেখে। এখানে এসে আনন্দ পেয়েচি, শান্তি পেয়েচি। মাধোলাল আমায় ছেলের মতো যত্ন করে, আমি ওকে কাকা বলে ডাকি। এ কাকা আর আপন কাকার কি তফাত তাই ভাবি। দু-চারটি ছেলে-মেয়েকে ইংরিজি পড়াই। সারাগ্রামে মুন্সী চমনলাল আর আমি, এই দুটি মহাজ্ঞানী পণ্ডিতব্যক্তি বিদ্যমান। বাকি যারা, তারা কায়ক্লেশে নাম সই করতে পারে।

রাখনি সন্ধ্যায় বলে, বাঙালি বাবু, আমি আজ তোমারজন্যে ভাওরা পাকাবো, খাবে তো ?

—সে কি ?

—ভাওরার নাম শোনো নি ?

রাখনি খুব অবাক হয়ে যায়। এ আবার কোন্ দেশের লোক, যে ভাওরার নাম শোনে নি ! সে হাত নেড়ে দেখিয়ে বললে, আটার হয়, এমনি গোল গোল। ঘুঁটের আগুনে পোড়াতে হয়। ঘি জবজবে আলুর চোখা দিয়ে খেতে হয়।

—আলু ভাতে দিয়ে ভালো লাগে ?

—খুব। খেয়ে দেখো। আর বাঙালি বাবু

—কি ?

—তুমি বাপজীকে বলো, তোমার কাছে আমি আংরেজিপড়বো।

—আজই বলবো।

তারপর রাখনি আমার সঙ্গে বসে গল্প করে, বাঙালি বাবু, এখানে থাকো, কোথাও যেতে দেবো না। মাঠা খাওয়াবো, ছাতুর লাড্ডু খাওয়াবো, মালাইমিঠা খাওয়াবো।

—তা না হয় খেলাম, কিন্তু মাছ ?মাছ না খেলে বাঙালির শরীর টিকবে কত দিন ?

রাখনি খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঝক্‌ঝক্ করে ওর মুক্তোর মতো দাঁতগুলি—চৌদ্দ-পনেরো বছরের সুশ্রী মেয়েরমুখের প্রাণখোলা হাসি।

বলে—মছলি কত আছে কুস্‌মাইয়ে, পাটনডঙ্গীর নহরেমাছ ধরতে যাবে ?

—সে গবর্নমেন্টের খাল। সেখানে ওদের লোক বসে আছে। মাছ ধরতে দেবে কেন ?

—আমি ধরবো। তোমাকে ধরে দেবো। মেয়েমানুষকে নহরের চৌকিদার কিছু বলবে না।

এবার আমি হেসে ফেলি। বললাম, গবর্নমেন্টের চৌকিদার মেয়ে পুরুষ বাছবে না রাখনি। চুরি যে করে তার আবার মেয়ে পুরুষ। দুজনেরই খুব হাসি। আমোদ লেগেছে দুজনেরই।

রাখনি এত ভালো মেয়ে, তার আপন-পর জ্ঞান ছিলনা। আমি ওদের বাড়িতে কেউ না, অন্নদাস বলা যেতে পারে, রাখনি কিন্তু আমাকে বড় আপনার জন ভাবতো। তার সর্বদা চেষ্টা ছিল যাতে আমি অভুক্ত না থাকি, খেয়ে আমার পেটভরে। এজন্যে তার কত যত্ন, কত অসম্ভব হাস্যকর প্রয়াস।

আমি বলতাম, রাখনি, আমি বিদেশি লোক। আজ এয়েছিকাল চলে যাবো—তুমি আমাকে অত ভালোবাসো কেন ?আমিচলে গেলে কষ্ট পাবে।

রাখনি বলতো—ইস্, চলে যাবে বইকি !

—তবে কি ?

—বিয়ে করবো তোমাকে। দুজনে বাস করবো আমাদেরবাড়ির পাশে।

—চলবে কিসে ?

—বাবার কাছ থেকে জমি চেয়ে নেবো। তুমি জমি চাষকরবে।

ওইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি ! আমার এমনি হাসি পেতো।এর মধ্যে সব ঠিকঠাক করে বসেচে। রাখনিকে আমারও বড্ডভালো লাগতো। ওর স্নেহ-যত্ন ভোলবার নয়। অবিশ্যি ওরবাবাও খুব ভালো, একদিনের জন্যেও আমার প্রতি তার অযত্ন দেখিনি।

আমি ওখানে মাসছয়েক থাকবার পরেই এক ঘটনাঘটলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে এসে দেখি বাড়ির সকলেরব্যস্ত চঞ্চল ভাব, মুখ গম্ভীর। শোনা গেল মাধোলালের স্ত্রীরপ্লেগ হয়েচে। প্লেগকে ওখানকার লোক বড্ড ভয় করে।বাড়িতে লোকজন আসা বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের চৌকিদার এগারো মাইল দূরবর্তী থানায় খবর দিতে ছুটলো। পরদিন সন্ধ্যায় মাধোলালের স্ত্রী মারা গেল, মাধোলালকে ধরলো প্লেগে। তৃতীয় দিনে মাধোলালও মারা গেল। একই সঙ্গে মাধোলালের এক বৃদ্ধা পিসিও দেহ রাখলেন। ছ'সাত দিনেরমধ্যে মাথোলালের বাড়ির সকলেই কাবার হল—রাখনি বাদে।প্লেগতখন আশেপাশের দু-একটি বাড়িতেও ধরেছে। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার এসে সকলকে প্লেগের টিকেও দিয়ে গেল।

বেঁচে গেলাম আমি ও রাখনি। আধমরা অবস্থায় বাঁচা।আমার তখন কোনো জ্ঞান-চৈতন্য নেই এমন অবস্থা। এমন দুর্দিনের মুখ কখনো দেখিনি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচি। মৃত্যুর সে কি করুণ দৃশ্য দেখেচি চোখের সামনে !রাখনিকে নিয়ে আরো মুশকিল—তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজের চোখের জল থামে না।

যখন সব মিটে শেষ হয়ে গেল, প্লেগ থামলো, তখনওদের বাড়িতে আমি আর রাখনি আর ভক্তদাস বলে ওদেরএক পুরনো চাকর—এই তিনজনে টিম্‌টিম করচি।

কয়েকদিন কেটে গেল। সরকারি লোকেরা এসে ঘরদোর ধুয়ে ধোঁয়া দিয়ে ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে পুরনো কাপড়চোপড় পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার আর ভালো লাগছে না, এখানথেকে বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু রাখনিকে কার কাছে ফেলেদিয়ে যাই—এই হয়েচে মহা সমস্যা।

এ আবার কি বিষম বন্ধনে ভগবান আমায় জড়ালেন তাইভাবি। বেশ ছিলাম স্বাধীন, খাই না খাই কোনো বন্ধন বা দায়িত্বছিল না।

গ্রামের লোক বলে, তুমি রাখনিকে বিয়ে করে ওদেরবাড়ি থাকো। অবস্থা ওদের সত্যিই ভালো। যথেষ্ট জমিজমা, গোরুবাছুর, গোলাভরা ধান, গম, যব, সর্ষে। এ সবের মালিকহয়ে থাকা বড় কম কথা নয়। ভেবে দ্যাখো বাংগালী বাবু, এবড় চাট্টিখানি কথা নয় আজকার দিনে।

রাখনি ?তার কথা কি বলবো, সে তো আমাকে বেশভালোবাসে। দিনরাত কান্নাকাটি করে, আমি তাকে বোঝাই, সান্ত্বনা দিই।

একদিন রাত্রে হল কি, সেই কুসুমবতী নদীর ধারে বসেআছি, রাত বেশি নয়—সবে সন্ধ্যা উতরেছে, ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার ঘন গাছের তলায়—এমন সময় রাখনি সেখানে এসে পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

চমকে উঠে বললাম, কে রে ?ও তুমি ! এমন করে আসতে হয় ?ভয় করে না আমার ?

—ভয় কিসের ?

—ভূতের।

—তুমি তো ভূত মাননা না বাবুজি—

—মানি নে, আবার ভূত না মানলেও ভয় করে এই অন্ধকার রাত্রে। বসো রাখনি, একটা কথা—

ও বসলো আমারই পাশে। বসে বললে—কি ?

—আমি ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবো, অনেকদিন হল এসেচি।

—যাবে ?আর আমি ?আমাদের বাড়িঘর ?

-ভক্তদাস তো রইল। ও তোমার দেখাশুনো করবে।আমিও মাঝে মাঝে সময় পেলে এসে দেখে যাবো।

—আমি যাবো তোমার সঙ্গে—

—কোথায় যাবে ?তা ছাড়া ঘরবাড়ি, গোরুবাছুর, গোলা, জমিজমা, এসব কি হবে ?

—ওসব ভক্তদাস নিক। আমার ওতে দরকার নেই। সত্যিবলচি বাবুজি, কি হবে গোরুবাছুর আর ঘরদোরে ?তুমি যাকেহয় বিলিয়ে দিয়ে যাও। আমি এখানে থাকবো না—আমারভালো লাগবে না—

কথা শেষ করে ও মিনতির সুরে আমার হাত দুটি ধরে বললে—আমায় ফেলে কোথাও যেয়ো না বাবুজি ! বলো যাবেনা ?আর যদি যাও আমায় নিয়ে যাবে—এখানে থাকবো কারকাছেতা বলো ?

—কেন, ভক্তদাস ?

—না, আমি থাকবো না। ভক্তদাস মরে গেলে তখন কার কাছে থাকবো ?

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।

—না, ব্যবস্থাতে দরকার নেই বাবুজি ! আমি তোমার সঙ্গে যাবোই।

আমি পড়ে গেলাম মহা ফাপরে ওর কথা শুনে। এতক্ষণ নির্জনে বসে এই কথাই কিন্তু আমি ভাবছিলাম। রাখনিকে নিয়েকি করি এই হয়েচে আজকাল আমার বড় ভাবনার কথা। আমিচুপ করে আছি দেখে রাখনি বললে—শুনবে বাবুজি আমারএকটা কথা?

-কি ?

—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। আমাকে শাদি করতে হবে না তোমাকে—চলো তুমি আর আমি কোথাও গিয়ে ভগবানের নাম করি। কি হবে এখানে থেকে ?ভালো লাগে না।

আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলাম। পনেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কথা সত্যিই আশ্চর্য। রাখনি এই বয়সে সংসার-বিরাগিণী হয়ে উঠলো কি ভাবে।

আমি বললাম—সত্যি ?যাবে ?

ও জোর করে বললে—নিশ্চয়ই যাবো। নিয়ে চলো আমাকে। এখানকার বিষয়-আশয় বিলিয়ে দাও কাউকে, নয়তো ভক্তদাসকে দাও, ও থাকুক এ বাড়িতে। ভগবানের নামকরিগে চলো।

গেলাম একদিন সত্যিই ওকে নিয়ে চলে। এলাম গণ্ডক নদী পার হয়ে, গোরখপুর হয়ে কাশী। সঙ্গে ছিল প্রায় চার-পাঁচশো টাকা আর রাখনির মায়ের অনেক সোনার গহনা।কাশী থেকে গেলাম হরিদ্বার। এদিকে তখন আমার মনে ভয় হয়েচে নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে চলে এসেচি—পুলিশেহয়তো উৎপাত করতে পারে।

এক ধর্মশালায় উঠে দিন-তিনেক থেকেই রাখনিকে নিয়েকনখলে গেলাম। এক পাণ্ডার বাড়ি ওকে রাখলাম। রাখনি বলে—তোমার কাছে থাকবো, এখানে কেন ?তুমি জায়গা ঠিককর, আমরা দুজনে সেখানে থেকে ভগবানের নাম করবো।

দিন দিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগলাম। হরিদ্বারে এসে পর্যন্ত ভগবানের পথে যাবার জন্যে ওর প্রাণব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

এক বাঙালি সাধুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল গঙ্গারধারের ঘাটে। তাঁর নাম স্বামী বাসুদেবানন্দ। তাঁর আশ্রমেওআমরা গেলাম। কনখলে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো দোতলাবাড়িতে তিনি থাকেন। স্থানটি নির্জন, বাঁধানো ঘাট পুরনো বাড়ির নিচেই, পুরনো মন্দির ঘাটের ওপরই। কিভাবে আলাপহল তা বলি।

আমরা সেই পুরনো ভাঙা ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম।সন্ধেবেলা। ওপারে কি একটা পাহাড় পরে নাম শুনেছিলামচণ্ডীর পাহাড়। রাখনির বেশ গলা, ও গুন গুন করে ওর বাবার মুখে শেখা একটা রামজীর ভজন ধরলে। দেখি ওর চোখছলছল করচে।

বললাম—রাখনি, আর একটু জোরে গাও, বেশলাগচে—

—না, গাইবো না।

—মার খাবে জোরে না গাইলে।

দুজনেই হেসে উঠি।

সত্যি, কি সুন্দর কেটেচে এই হরিদ্বারের গঙ্গার ধারেরদিনগুলি মনে মনে তাই ভাবি। কি সুন্দর সন্ধ্যা, কি চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো গঙ্গার নীলধারার ওপর।

আমরা বসে আছি, এমন সময়ে ঘাটের ওপরের মন্দিরেআরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমরা ঘাট থেকে উঠে আরতিদেখতে গেলাম। সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি। আরতির পরে বৃদ্ধ পূজারী আমাদের হাতে প্রসাদের বাতাসা বিতরণ করলেন। স্বজাতীয় চেহারা দেখে মনে হল তিনি বাঙালি। দেখলেই ভক্তি হয়। রাখনি বললে, জিগ্যেস করো না উনি কি এ মন্দিরে থাকেন ?

আমি বিনীত ভাবে বললাম—আচ্ছা, আপনি কি বাঙালি ?

তিনি হেসে বললেন, হ্যাঁ। তুমিও তো বাঙালি !

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায় উঠেচ এখানে ?

—এক পাণ্ডার বাড়ি।

আমি তাঁকে রাখনির বিবরণ সব খুলে বললাম। রাখনিও ছলছল চোখে দেহাতি হিন্দিতে তার মনের কথা খুলে বললে।আমরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। তাঁর আশ্রমে আমাদেরস্থান দিলেন।

রাখনি কি খুশি ! সাত দিনের মধ্যে সে সাধিকা সন্ন্যাসিনীবনে গেল, পনেরো বছরের মেয়ে।

কিতার ভজন গাননিষ্ঠা ! মন্দির-মার্জনা করতে লাগলো যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে। বিগ্রহের পুজোর সমস্ত আয়োজন, ফুল তোলা, পুজোর বাসন ধোয়া মাজা, ধূপধুনো দেওয়া—সব ওকরবে কি একাগ্র মনে, কি ভক্তির সঙ্গে ! এখানে এসেও ভাবতে লাগলো যেন নিজের স্থানটিতে এসে পৌঁছেচে এতদিনে।

বাসুদেবানন্দ সন্ধ্যাবেলা ওর মুখে হিন্দি ভজন শুনে বড়খুশি। একটি না দুটি মাত্র ভজন সে জানে, তার বাবার মুখেশোনা। তার মধ্যে একটা হল তুলসীদাসেরঃ

"পঙ্গু চড়ে গিরি'পর গহন মূক করে বাচাল"

বাসুদেবানন্দ ওর পিঠ সস্নেহেচাপড়ে বলতেন—পাগলি, আর জন্মে তুই ব্রজের গোপী ছিলি। এই বয়সে এত কৃষ্ণভক্তি এল কোথা থেকে তাই ভাবি।

তার ফুলের মতো পবিত্র বালিকা-মনটি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে এতটুকু ভক্তির আলো পাবার জন্যে। মন্দিরেরবিগ্রহের অমন প্রাণঢালা সেবা দেখে স্বামীজি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাখনির চেহারা দিনে দিনে বদলাচ্চে। সে যেন ওই মন্দিরে চিহ্নিত দেবদাসী কতকাল থেকে।

রাখনি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। দিন দিন সেমন্দিরের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্চে। ও দূরে সরে যাচ্চে ক্রমশই আমার কাছ থেকে।

একদিন ওকে বলি—রাখনি, আমি ভাবচি এখান থেকেচলে যাবো।

ভেবেছিলুম, ও বোধ হয় বলবে, আমাকেও নিয়ে চলো।

কিন্তু ও নির্বিকার ভাবে বললে—কবে ?

—দু-একদিনের মধ্যেই।

—আবার কবে আসবে ?

—দেখি।

এতেও ও কিছু বললে না। রাখনির মন অন্যদিকে চলে গিয়েচে। আমায় আর ও চায় না। বড় দুঃখ হল মনে। মনে পড়ল কুসুমবতীর তীরে সেই সব সন্ধ্যার কথা। কি মধুর হয়েই আছে সেগুলির স্মৃতি মনের কোণে। কতদূরে চলে গিয়েচেসে-সব দিন। আর কোনোদিন ফিরবে না, বেশ বুঝতে পারিআর ফিরবে না।

এক এক সময় ভাবি, ভুল আমিই করেচি। রাখনিকে বিয়েকরে ওদের গ্রামেই বাস করতে পারতাম। সকলেই বলেছিল, রাখনিও বলেছিল, কারো কথা শুনি নি।

একদিন কাউকে কিছু না বলে কনখল থেকে রওনা হলাম। আজ সাত-আট মাস হয়ে গেল, আর যাই নি, চিঠিপত্রও দিই নি।

যাবোও না।

আশা করি রাখনি সুখি হয়েছে।

তবুও ভুলতে পারিনে কুসমাইয়ের ধারের সেই অপূর্বসন্ধ্যাগুলি। রাখনি আমার হাত ধরে বলেছিল, কোথায় চলে যাবে বাবুজি ?যাও তো আমায় নিয়ে যেয়ো।

পেছনের দিন পেছনেই পড়ে থাকে, আর কোনোদিনই সামনে এসে এগিয়ে দাঁড়ায় না।

আমি এসে আবার কাকার বাড়ি ঢুকেচি। কাকার গোরুবাছুর বাঁধি, হাটবাজার করি, খুড়িমার মুখনাড়া খাই—সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভাতও। নয়তো এ বাজারে ভাত পাচ্ছি কোথায় ?